সংস্কারের হালচাল

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক, (১৫ মে, ২০০৮)

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দল তথা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। বর্তমার সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে '*গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮*'এর একটি খসড়া চূড়ান্ত করেছে। খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়ের পর্যালোচনা এবং উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনের পর অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হবে। প্রস্তাবিত নির্বাচনী আইনে কী পরিবর্তন আনা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে কী সুপারিশ প্রদান করেছিল? একইসাথে 'সুজনে'র পক্ষ থেকে কী প্রস্তাব করা হয়েছিল মূলত এই নিবন্ধে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বিষয়	নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ প্রস্তাব	রাজনৈতিক দলের মতামত	'সুজনে'র প্রস্তাব/মন্তব্য
সজ্ঞা: আইন প্রয়োগকারী সংস্থা	পুলিশ বাহিনী, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ন আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস ও কোস্ট গার্ড বাহিনী এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্ম বিভাগসমূহ। (এভাবেই বিদ্যমান আইনেও আছে।)	**বিএনপি** সেনাবাহিনীকে নির্বাচনে ম্যাজেস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের সুপারিশ করেছে। অন্য কোন রাজনৈতিক দল এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি।	'সুজন' আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সজ্ঞা থেকে 'বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্ম বিভাগসমূহ' বাদ দেবার প্রস্তাব করেছে।
নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ	নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে '*নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০০৮*' জারি করা হয়েছে।	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ** নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার জন্য **১১**টি বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কমিশনারের সংখ্যা ও নিয়োগ, উপজেলা পর্যন্ত কমিশনের সাংগঠনিক বিস্তৃতি, নির্বাচনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনের আগে ও পরে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত কমিশনের অধীনে রাখা এবং এ সময়কালে অপরাধের জন্য কমিশন কর্তৃক শাস্তি প্রদানের বিধান রাখা ইত্যাদি। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** নির্বাচন কমিশনকে সচিবালয়কে নির্বাহি বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা, স্বতন্ত্র টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক চালু করা, নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বহিনীকে কমিশনের অধীনে ন্যস্ত ও তাদের কর্তব্যে অবহেলা বা অপরাধের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি সুপারিশ করেছে। **জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি।	'সুজনে'র পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্বাধীন করার এবং কমিশনকে আর্থিক স্বাধীনতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। একইসাথে কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ওপর জোর দেয়া হয়। '*নির্বাচন কমিশন সচিবালয় অধ্যাদেশ-২০০৮*' পাশ করার ফলে কমিশনের সচিবালয় নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত হলেও কমিশনের সদস্য সংখ্যা ও নিয়োগ পদ্ধতি এবং কর্মের শর্তাবলী এখনও নির্ধারিত হয়নি। একইসাথে কমিশনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও প্রয়োজন।
মনোনয়ন পত্রের সাথে প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি ও সম্পদের	কমিশন হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের আট ধরনের ব্যক্তিগত তথ্যাদি হলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করার জন্য প্রস্তাব করেছে। তথ্যগুলো হলো: সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি; বর্তমানে তিনি কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কি না; অতীতে তার বিরূদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকলে তার রায়/ফলাফল কী ছিল; ব্যবসা/পেশার বিবরণী; আয়ের উৎসসমূহ; অতীতে	**জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** – অতীতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকলে নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কি কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কি পরিমাণ অর্জন করেছেন – এ অংশটি অপ্রয়োজনীয় মনে করে এবং বিলুপ্তির সুপারিশ করেছে। এছাড়া	প্রস্তাবিত সবগুলো বিষয় কমিশনের নিকট দখিল করা 'সুজনে'র প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে রাজনীতিতে আরও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে হলফনামায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক: ক) প্রার্থী বা তার ওপর নির্ভরশীলদের সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাথে কোন ব্যবসায়িক

বিবরণী দাখিল (ধারা ১৪)	তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে থাকলে নির্বাচনের পূর্বে ভোটারদের কী কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কী পরিমাণ অর্জন করেছেন; তার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী; এবং কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে একক বা যৌথভাবে বা তার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ। এছাড়াও ৫০ ধারায় উল্লেখিত নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের আয়ের উৎস সম্পর্কিত বিবরণী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে (পূর্বে নির্বাচিত হয়ে থাকলে প্রযোজ্য নয়) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার ১% ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা ও যে দল থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন তার সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/সম পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র মনোনয়নপত্রের সাথে দাখিল করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	**কমিউনিস্ট পার্টি** সর্বশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত কপি এবং **জাতীয় পার্টি** 'অতীতে তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত কোন ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কি না, থাকলে তার রায়/ফলাফল কি ছিল' এ বিষয়টি বাদ দেওয়ার সুপারিশ করেছে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ** এ বিষয়ে কোন মতামত দেয় নি।	সম্পর্ক থাকলে তার বিবরণী; খ) মনোনয়ন পাওয়ার জন্য এই পর্যন্ত প্রার্থী নিজে এবং তার পক্ষে অন্য কেউ কত টাকা ব্যয় করেছে তার বিবরণী; গ) প্রার্থীর জীবনযাত্রার মানের বিবরণীসহ পূর্ববর্তী তিন বছর দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নের সত্যায়িত অনুলিপি। সকল তথ্যাদি জনগণের নিকট সময়মতো বিতরণের জন্য মনোয়নপ্রত্রের সাথে দাখিলের পরিবর্তে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তিন দিনের মধ্যে নির্বাচনে 'অংশগ্রহণে ইচ্ছুক' (intent to run) প্রার্থীগণ কমিশনের নিকট জমা দেওয়ার প্রস্তাব করে। এছাড়াও রাজনৈতিক দল কর্তৃক তাদের মনোনীত প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলোও প্রস্তাবে অন্তভূর্ক্ত ছিল: (১) রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যাদির আসনভিত্তিক সার-সংক্ষেপ তৈরি করে জনগণের অবগতির জন্য গণমাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করা; (২) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার যে কোন প্রার্থী বা ভোটার যে কোন প্রার্থীর দাখিলকৃত হলফনামার বিরুদ্ধে পাল্টা হলফনামা (counter affidavit) দাখিলের বিধান রাখা এবং গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা; (৩) মনোনয়নপত্র জমাদানকালে কোন প্রার্থী কিংবা তার পক্ষে পাঁচ জন ব্যক্তির বেশি উপস্থিত না থাকা এবং কোন মিছিল বা শোডাউনের আয়োজন না করার বিধান রাখা।
প্রার্থীর সংসদ সদস্য হওয়ার বা থাকবার অযোগ্যতা (অনুচ্ছেদ-১৩)	দুর্নীতিমূলক এবং বেআইনী কাজের (corrupt and illegal practices) জন্য দুই বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে থাকলে এবং মুক্তিলাভের পর ৫ বছর অতিবাহিত না হলে; দুর্নীতির কারণে প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের চাকুরি হতে বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হলে; প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্ম বিভাগের কোন চাকুরি হইতে পদত্যাগ, অবসর, বরখাস্ত, অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত অথবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তি বাতিল বা মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত না হলে; কোন বিদেশী রাষ্ট্র হতে অনুদান বা	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পাটি (সিপিবি)** নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবের সাথে মোটামুটিভাবে একমত। শুধুমাত্র সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল বিষয়ে 'অথবা এই পাওনার সত্যতার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আপিল না করে থাকেন' এ শব্দগুলো যুক্ত করার সুপারিশ করেছে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সকল** ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ততার মেয়াদ পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর করা; আইনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ সুপ্রিম	সংসদ সদস্য হওয়াার বা থাকবার অযোগ্যতার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন যে সকল প্রস্তাব করেছে, 'সুজনে'রও মোটামুটিভাবে একই প্রস্তাব ছিলো। এছাড়াও 'সুজন' নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্তির জন্য সুপারিশ করছে – ক) ঋণ খেলাপীর ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পূর্ববর্তী ছয় মাসের পরিবর্তে এক বছরের বিধান রাখা। এক্ষেত্রে এক বছর পূর্বে ঋণ পুনর্তফসিলিকরণও অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা

	তহবিল গ্রহণ করে থাকে এমন বেসরকারি সংস্থার কার্যনিবাহি পদে (প্রথম প্রস্তাবনায় কার্যনির্বাহির সাথে কর্মচারি কথাটিও যুক্ত ছিল) কর্মরত আছেন বা ঐরূপ পদ থেকে পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ বা পদচ্যুত হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত না হলে; কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে তিন বছর অতিবাহিত না হলে, (তবে নির্বাচন কমিশনের সাথে কোন রাজনৈতিক দলের প্রথম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না); কোন সমবায় সমিতির এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ব্যতীত, সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন চুক্তির বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য, তিনি নিজ নামে বা তার ট্রাস্টি হিসাবে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে বা তার সুবিধার্থে বা উপলক্ষে বা কোন হিন্দু যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে তার কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলে; বসবাসের নিমিত্ত গৃহ-নির্মাণের জন্য কোন ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ কিংবা কৃষিকাজের জন্য গৃহীত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখের পূর্ববর্তী ছয় মাসের (প্রথম খসড়া প্রস্তবনায় যা এক বছর ছিল) মধ্যে কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হিসেবে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যাংক বা অর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা এর কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে; ব্যক্তিগতভাবে বা কোন কোম্পানীর চেয়ারম্যান বা পরিচালক হিসাবে, বা কোন ফার্মের অংশীদার হিসাবে বা সংসদ সদস্য হিসাবে, বা কোন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা ওয়ার্ড কমিশনার হিসাবে কিংবা উপজেলা অথবা পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী তিন মাস বা তদুর্দ্ধ সময়ের প্রদেয় টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধে খেলাপী হয়ে থাকলে; প্রজাতন্ত্রের কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকলে; জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আদালতে/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধী হিসেবে দণ্ডিত হয়ে থাকলে (প্রথম খসড়া প্রস্তাবনায় এ ধারাটি ছিল না);	কোর্টের আপিল বিভাগ/হাই কোর্ট বিভাগ কর্তৃক সাজা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলে ঘোষণা না করা; নিজস্ব সম্পদ ছাড়া দেশী অনুদান/তহবিল গ্রহণ করে থাকে এরূপ বেসরকারি সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের ক্ষেত্রেও বিদেশী অনুদান গ্রহণকারী সংস্থার ন্যায় বিধান রাখা; বিল খেলাপীর বিষয়টি বিলুপ্ত করা; দলীয় সদস্য হিসেবে তিন বছরের মেয়াদ না রাখা; এবং যুদ্ধাপরাধী ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করার প্রস্তাব করছে। **জাতীয় পার্টি** ঋণ খেলাপীর ক্ষেত্রে মনোয়নপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী এক বছরের পরিবর্তে ছয় মাস করা এবং বিল খেলাপির বিষয়টি বিলুপ্তির প্রস্তাব করেছে। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এ বিষয়ে কোন মতামত দেয় নি। **এছাড়া** প্রায় সকল দলই স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার প্রস্তাব করেছে।	করা। খ) কোন ব্যক্তি স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভূক্ত কোন কোম্পানির উদ্যোক্তা হিসেবে বাজারে প্রাথমিক শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহ করে থাকলে এবং পরপর দুই বছর সাধারণ সভা ও লভ্যাংশ পরিশোধ না করে থাকলে।
ব্যালট পেপারে প্রার্থীর ছবি ও 'না' ভোটের বিধান রাখা	'না' ভোটের বিধান এবং 'না' ভোটের পক্ষে যদি প্রদত্ত ভোটের অর্ধেক বা ততোধিক হয় তবে পুনরায় নির্বাচনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যালট পেপারে প্রার্থীর ছবির ব্যাপারে কমিশন কোন প্রস্তাব করে নি।	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** 'না' ভোটের বিষয়ে কোন মতামত দেয় নি। **জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী** 'না' ভোটের বিধান না রাখার জন্য সুপারিশ করেছে।	'সুজনে'র পক্ষ থেকে 'না' ভোটের পক্ষে প্রদত্ত ভোট অর্ধেকের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ভোট পড়লেই পুনরায় নির্বাচনের বিধান রাখা এবং পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্বে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীগণ যেন পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারে তারও বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যালট পেপারে দলীয় প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর ছবি প্রদানের প্রস্তাবও 'সুজনে'র প্রস্তাবে অর্ন্তভূক্ত ছিলো।

নির্বাচনী ব্যয় ও ব্যয়হ্রাস	নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ ৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। তবে প্রার্থীর খরচ কোন তারিখ হতে 'নির্বাচনী খরচ' হিসেবে গণ্য হবে তা নির্বাচনী ব্যয়ের সংজ্ঞায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই।	**বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও গণতন্ত্রী পার্টি** নির্বাচনী ব্যয় ৫ লক্ষের পরিবর্তে সর্বোচ্চ ৩ লক্ষ টাকা, **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি** নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা করার সুপারিশ করেছে। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট** নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা ৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ২৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করেছে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ** নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের জন্য বেশ কিছু প্রস্তাবও করেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কমিশনের পক্ষ থেকে প্রচারণা সভার আয়োজন করা, পোস্টার একটি নির্দিষ্ট স্থানে লাগানোর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।	সুজনের প্রস্তাব অনুযায়ী নির্বাচনী খরচ বলতে জাতীয় সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার তারিখের এক বছর পূর্বে এবং উপনির্বাচন বা সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ক্ষেত্রে আসন শূন্য হবার তারিখ হতে প্রার্থীর মনোনয়ন প্রাপ্তির ও প্রচারের লক্ষ্যে প্রার্থীর নিজের বা তার পক্ষে মনোনয়ন ও প্রচারণার জন্য সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খরচ নির্বাচনী ব্যয় বলে গণ্য হবে। যেখানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করেছে সেখানে কমিশনের নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব বোধগম্য নয়। সৎ ও যোগ্য এবং স্বল্প আয়ের প্রার্থীগণ যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন এবং তা কোনভাবেই ৫ লক্ষ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। এজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে: ১. রির্টানিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক যথাসম্ভব সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর উপস্থিতিতে প্রতি ইউনিয়নে এবং পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে প্রজেকশন মিটিং এর ব্যবস্থা করা। ২. রির্টানিং অফিসার প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামার মাধ্যমে দাখিলকৃত তথ্যের ভিত্তিতে কমন পোস্টার তেরি করে প্রার্থীদের মধ্যে সমভাবে বিতরণের ব্যবস্থা করা ৩. প্রার্থীগণ কর্তৃক জনসভা, মিটিং, মিছিল, শোডাউন, গেট বা তোরণ নির্মাণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা।
রাজনৈতিক দলের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল (ধারা ৫৪)	**(১)** কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল অন্য কোন দেশ বা বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি সংস্থা বা জন্মগতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক নয় এমন ব্যক্তি বা এরূপ ব্যক্তি দ্বারা সংগঠিত বা পরিচালিত কোন সংগঠনের নিকট হতে কোন দান, অনুদান, উপহার বা অর্থ গ্রহণ করতে পারবে না। (২) প্রস্তাবিত আইনানুযায়ী, যে সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন দেবে সে সকল দল নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচন সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবে। বিশেষ করে ৫ হাজার (প্রথম প্রস্তবনায় যা এক হাজার টাকা ছিল) টাকার উর্দ্ধে সকল প্রাপ্তির ব্যাপারে অর্থ দাতাদের নাম ও ঠিকানাসহ প্রত্যেকের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ এবং প্রাপ্তির প্রকার পরিষ্কারভাবে দেখাতে হবে।	**জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এ সকল প্রস্তাবের প্রায় সবগুলোই অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**ও দলের নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমান অবাস্তব বলে মন্তব্য করেছে এবং এর পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছে। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** ৫৪ (১) ধারায় উল্লেখিত 'অন্য কোন দেশ' এ শব্দগুলোর পরিবর্তে 'অন্য কোন দেশের সংগঠন' শব্দগুলো যুক্ত করা এবং উপধারা (২) এর শেষদিকে 'প্রাপ্তির প্রকার' শব্দগুলির পরে 'এবং অনধিক ১০০ টাকা মূল্যে কুপনর দ্বারা	নির্বাচনী ব্যয় কোনভাবেই ৫ লক্ষ টাকার বেশি না করা 'সুজনে'র প্রস্তাব ছিল। দলীয় নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা বৃদ্ধি করার অর্থ হলো কালো টাকার মালিকদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ করে দেয়া।

	(৩) দলের তহবিল কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখতে ও সংরক্ষণ করতে হবে। (৪) প্রার্থী মনোনয়নকারী রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ ব্যয়ের সীমা হলো: প্রার্থীর সংখ্যা দুই'শর বেশি হলে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (পূর্বে ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ); এক'শর বেশি কিন্তু দুই'শর উর্দ্ধে না হলে ৩ কোটি টাকা (পূর্বে ছিল ১ কোটি); এক'শর বেশি না হলে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (পূর্বে ছিল ৭৫ লক্ষ); পঞ্চাশের বেশি না হলে ৭৫ লক্ষ টাকা (পূর্বে এ ধারাটি ছিল না); (৫) কোন রাজনৈতিক দল ২০ হাজার টাকার (পূর্বে ছিল ১ হাজার) বেশি কোন চাঁদা চেক ব্যাতিত গ্রহণ করতে পারবে না। (৬) কোন রাজনৈতিক দল এই অনুচ্ছেদের কোন বিধান লংঘন করলে অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দণ্ডিত হবে।	পরিচালিত গণসংগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ এবং ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত কূপনের হিসাব' শব্দগুলো যুক্ত করার প্রস্তাব করেছে। নির্বাচন কমিশন তাদের প্রস্তাবনা বিবেচনায় নিয়ে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ব্যয়ের হার পুনর্নির্ধারণ করেছে।	
নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিল (ধারা ৫৫)	ক) প্রার্থী মনোনয়নকারী রাাজনৈতিক দলকে নির্বাচন সমাপ্তির ৯০ দিনের মধ্যে (পূর্বে ছিল ৬০ দিন) কমিশনের নিকট এবং প্রত্যেক প্রার্থীকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে (পূর্বে ছিল ১৫ দিন) সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনী ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী দাখিল করার প্রস্তাব করেছে। খ) কোন রাজনৈতিক দল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হিসাব দখিলে ব্যর্থ হলে কমিশন ৩০ দিনের সময় প্রদান করে এটি প্রেরণের জন্য সতর্কীকরণ নোটিশ দিবে। উক্ত সময়কালের মধ্যেও হিসাব দাখিলে ব্যর্থ হলে ১০,০০০ টাকা জরিমানা সাপেক্ষে পুনরায় ১৫ দিনের সময় দেওয়া হবে। তারপরও কোন দল হিসাব প্রদানে ব্যর্থ হলে কমিশন দলের নিবন্ধন বতিল করার প্রস্তাব করেছে।	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ** এই উদ্যোগের প্রশংসা করে। **জাতীয় পার্টি** এ ধারাটি বিলুপ্ত করে নির্বাচনী ব্যয়ের সকল হিসাব ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করার বিধান করার সুপারিশ করেছে। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের** মতে এতে ক্ষমতার অপব্যহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে তাই এ ধারাটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছে।	নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দাখিলের বিষয়ে 'সুজনে'র প্রস্তাব হলো – রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে ৬০ দিন এবং প্রার্থীর ক্ষেত্রে ১৫ দিন।
নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ ও প্রার্থীতা বাতিল (ধারা ৫৬)	নির্বাচনী আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণী, রিটার্ন এবং দলিল-দস্তাবেজ জনগণের অবগতির জন্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েব-সাইটে প্রকাশ করা এবং এ সকল বিবরণীতে কোন ভুল তথ্য পরিবেশন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের ঘটনা পরবর্তীতে উদ্ঘাটিত হলে নির্বাচন বাতিল ও শূণ্য আসনে পুনরায় নির্বাচনের ব্যবস্থা (পূর্ববর্তী প্রস্তাবনায় নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বারা পূরণের প্রস্তাব ছিল) করার প্রস্তাব করা হয়েছে।	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট** পার্টি এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এই ধারাটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করে। অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল ভুল তথ্য দাখিল বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপনের কারণে সংশ্লিষ্ট আসনে নির্বাচন বাতিল হলে, যোগ্যতা সম্পন্ন নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বারা শূণ্য আসন পূরণের পরিবর্তে নতুন করে নির্বাচনের প্রস্তাব করেছিল, যা নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ প্রস্তাবে গ্রহণ করেছে।	নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির তত্ত্বাবধানে তিন মাসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য, রির্টান ও দলিলসমূহের নিরীক্ষা সম্পন্ন করার প্রস্তাব 'সুজন' এর পক্ষ থেকে করা হয়। ভুল তথ্য পরিবেশন বা গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য গোপনের করা ছাড়াও কোন প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল আইন মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য দাখিল না করলে সংশ্লিষ্ট আসনের নির্বাচন এবং রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে নিবন্ধন বাতিলেরও প্রস্তাব করা হয়। ভুল তথ্য পরিবেশন বা গুরুত্ব পূর্ণ তথ্য গোপনের কারণে কোন আসনে নির্বাচন বাতিল হলে পুর্ননির্বাচনের পরিবর্তে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী দ্বারা উক্ত আসন পূরণ করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত বলে

			'সুজন' মনে করে, যা কমিশনের প্রথম প্রস্তবনায় ছিল।
নির্বাচনী দরখাস্ত হাইকোর্টে দাখিল (ধারা ৫৮)	এই অধ্যায়ের বিধান অনুযায়ী নির্বাচনী প্রার্থী কর্তৃক পেশকৃত নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত কোন নির্বাচন সংক্ষে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না বলে প্রস্তাব করা হয়েছে।	কৃষক শ্রমিক জনতা লীঘ এধারাটির অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করে বথিরের সুপরিশ করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি।	গণতন্ত্রের স্বার্থে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাড়াও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার নিবন্ধিত ভোটারেরও নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে দরখাস্ত করার প্রস্তাব 'সুজনে'র পক্ষ থেকে করা হয়। ভারতে এরূপ বিধান রয়েছে।
নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি (ধারা ৬১ ও ৬৫)	নির্বাচনী দরখাস্তের নিস্পত্তির জন্য হাইকোর্ট বিভাগে এককভাবে পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ গঠনপূর্বক এবং দরখাস্ত দাখিল হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তা নিস্পত্তি করা এবং হাইকোর্ট বিভাগের কোন রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপীল দায়েরের দুই মাসের মধ্যে এবং আপিল মঞ্জুর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে সমস্ত কেস নিস্পত্তি করার বিধান রাখা হয়েছে।	**বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ** মামলার নিস্পত্তির বিষয়ে হাইকোর্ট কোর্টে বিচার ছয়মাসের মধ্যে, লীভ টু আপিল নিস্পত্তি দুই মাসের মধ্যে এবং আপিল বিভাগের বিচার ছয় মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করার যে বিধান আছে তা বাস্তবায়নের জন্য হাইকোর্টে অতিরিক্ত বেঞ্চ বা কর্তব্য নির্দিষ্ট (ডেলিকেটেড বেঞ্চ) বেঞ্চ গঠন করার জন্য প্রস্তাব করে। এজন্য প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** নির্বাচনী বিরোধ নিস্পত্তির জন্য হাইকোর্টে কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে সেই বিষয়ে নির্বাচনী মামলা দুইমাসের মধ্যে মীমাংসার ব্যবস্থা এবং এ সংক্রান্ত আপিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বেঞ্চ কর্তৃক তিনমাসের মধ্যে নিস্পত্তি করার সুপারিশ করে। **জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করে নি। অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক দল দ্রুততম সময়ের মধ্যে নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তির পক্ষে মত দিয়েছে।	'সুজনে'র পক্ষ থেকে নির্বাচনী মামলার দ্রুত নিস্পত্তির প্রস্তাব করা হয়। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যুক্ত করাও আবশ্যক বলে 'সুজন' মনে করে: ক) নির্বাচনী মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত বেঞ্চসমূহে শুধুমাত্র এ সকল মামলাই পরিচালনা করবে। খ) অন্যান্য আইন বা বিধিতে যা কিছু থাকুক না কেন বা মামলা সংশ্লিষ্ট পক্ষের পদমর্যাদাগত অধিকার (priviledge) থাকুক না কেন, হাইকোর্ট ডিভিশন মামলার শুনানী মুলতবি করবেন না, যদি না, বিচারের স্বার্থে অনুরূপ মুলতবী প্রয়োজন হয় এবং মামলার কার্যক্রম বিরামহীনভাবে চলবে। গ) এভাবে গঠিত হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ মামলা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিচারকের অবসরগ্রহণ বা পদত্যাগ বা মৃত্যু ব্যতিরেকে বিলুপ্তি বা পুনর্গঠন করা যাবে না।
রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের শর্তাবলী ও অযোগ্যতা (ধারা ৯৫)	প্রস্তাবিত খসড়া আইনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। নিবন্ধনের শর্তাবলী: (ক) বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দরখাস্ত করার তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে দলীয় নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে কমপক্ষে একটি আসন লাভ; বা **(খ)** উপরোক্ত সংসদ সমূহের নির্বাচনের যে কোন একটিতে আবেদনকারীর দল কর্তৃক নির্বাচনে অংশগ্রহণকৃত আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের ৫% ভোট লাভ; বা (গ) দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে সাংগঠনিক কাঠমোর স্থিতি হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ একটি সক্রিয়	দলীয় কমিটির সদস্য কিভাবে নির্বাচিত হবে তা দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত হবে বলে মনে করে **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ**। কমিটিতে ৩৩% মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিষয়ে আওয়ামী লীগ নীতিগতভবে একমত। তবে তা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন এবং পর্যাযক্রমে তা ৫০%-তে উন্নীত করার সুপারিশ করে। অঙ্গ সংগঠন এবং	'সুজন' রাজনৈতিক দলের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আরও কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে: (ক) দলের সকল আয়-ব্যয় ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে পরিচালনা করা; (খ) ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনী ইশতেহার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে সে বিষয়ে প্রতি বৎসর জাতীয় সংসদে প্রতিবেদন দাখিল করা এবং এর কপি নির্বাচন কমিশনকে প্রদান

	কেন্দ্রীয় দপ্তর এবং অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ (যা প্রথম প্রস্তাবনায় ছিল অর্ধেক) প্রশাসনিক জেলায় জেলা কমিটিসহ কার্যকর জেলা দপ্তরসমূহ এবং অন্যূন ১০০টি উপজেলা বা ক্ষেত্রমতে মেট্রপলিটন থানায় ন্যূন পক্ষে ২০০ ভোটার সদস্য হিসেবে দলে তালিকাভুক্তি। এছাড়াও দলীয় গঠনতন্ত্রে গণতান্ত্রিক রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী দল পরিচালনার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল কমিটির সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা (প্রথম প্রস্তাবনায় গোপন ব্যালটের মাধ্যমে দলীয় কমিটির সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব ছিল), সকল পর্যাযের কমিটিতে ন্যূন পক্ষে ৩৩% মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষণ যা ২০২০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা, অঙ্গ সংগঠন না থাকা এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন দলীয় কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর প্যানেল থেকে পার্লামেন্টারী বোর্ডের প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করার বিধান ইত্যাদি। কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধীকরণে অযোগ্য হবে যদি: (ক) দলীয় গঠনতন্ত্রে সংবিধানের পরিপন্থী কিছু থাকে; ধর্ম, গোত্র, ভাষা, লিঙ্গভেদে বৈষম্য প্রতীয়মান হয়; নাম, পতাকা, চিহ্ন বা কোন কর্মকাণ্ড দ্বারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট বা দেশকে বিচ্ছিন্নতাবদের দিকে নিয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে; দলবিহীন বা একদলীয় শাসন কায়েমের উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়; দলের গঠনতন্ত্রে দেশের বাইরে দলীয় সংগঠন বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিধান থাকে; প্রস্তাবিত নামে ইতিপূর্বে কোন রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত হয়ে থাকলে এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন রাজনৈতিক দল হয়ে থাকলে।	দেশের বাইরে দলীয় শাখা রাখার পক্ষে **আওয়ামী লীগ**। **বিএনপি** সকল কমিটিতে ৩৩% মহিলা সদস্য রাখার প্রস্তাবটি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে। **জাতীয় পার্টি** দলীয় কমিটিতে মহিলাদের জন্য ৩৩% এর পরিবর্তে ৫% সংরক্ষন, পার্লমেন্টারি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান এবং অঙ্গ-সংগঠন ও বিদেশে দলীয় শাখা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেছে। তবে মহিলা ও যুব সংগঠন রাখার পক্ষে সুপারিশ করছে। **বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি** অঙ্গ-সংগঠন নিষিদ্ধ করা পক্ষে, তবে তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সমিতি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি গঠন করার এবং সংবিধানে বর্ণিত সকল রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দল করার বিষয়ে কোন বাধা না রাখার পক্ষে। সংসদে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে 'নির্বাচনী এলাকার দলের সদস্যদের সুপারিশ বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন বোর্ড নির্ধারিত নীতিমালার ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার প্রস্তাব করে। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** দলীয় কমিটিতে ৩৩% মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের পরিবর্তে শুধুমাত্র মহিলা প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ছাড়া প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধে জড়িত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সংগঠিত দলকে নিবন্ধনে অযোগ্য ঘোষণা করার সুপারিশ করেছে। (রাজনৈতিক দলের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন সংস্কার প্রস্তাবে বেশ কিছু পরিবর্তন করেছে)	করা ও জনসম্মুখে প্রকাশ করা; (গ) প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তার প্রাথমিক সদস্যদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ এবং এই রেজিস্টার ন্যূনতমভাবে প্রতি বৎসর আপডেট করে দলীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা; (ঘ) প্রতি তিন বৎসর পর পর নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহকে নিবন্ধন নবায়ন করা; (ঙ) কমিশনের নিকট অডিট রিপোর্ট দাখিল করা। এছাড়াও জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে দলীয় সকল কমিটিতে ৫০% নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। 'সুজন' প্রথমবারের মতো নিবন্ধনের প্রস্তাব শিথিল করার পক্ষে তবে নাম সর্বস্ব দলের বিলোপ ঘটাবার জন্য আগামী নির্বাচনে একটি নির্দিষ্ট পরিমানের (যেমন ১%) ভোট না পেলে নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ করেছে।
নিবন্ধন বাতিল (ধারা ১০২)	দলের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক/সমতুল্য কর্মকর্তা নিবন্ধন বাতিলের জন্য আবেদন করলে; নিবন্ধিত কোন দল পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে; আইন মোতাবেক কমিশনে প্রেরিতব্য কোন তথ্য পর পর তিন বৎসর প্রেরণে ব্যর্থ হলে; পর পর দুইটি সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে এবং নিবন্ধনের শর্তাবলী লঙ্ঘন করলে নিবন্ধন বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।	**প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই** দলীয় সর্বোচ্চ ফোরামের সিদ্ধান্ত মোতাবেক চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক/সমতুল্য কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ করেছে, যা কমিশন সর্বশেষ প্রস্তাবে গ্রহণ করেছে। **জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** জাতীয় নির্বাচনে সমগ্র	'সুজন'ও নিবন্ধনের শর্তাবলী লঙ্ঘনের কারণে নিবন্ধন বাতিলের সুপারিশ করে।

		প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে ২% পেতে ব্যর্থ হলে নিবন্ধন বাতিলের প্রস্তাব করেছে।	
নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা	বিদ্যমান আইনে, নির্বাচনী আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের জন্য প্রার্থীতা বাতিল বা নির্বাচন স্থগিত/বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। প্রস্তাবিত আইনে অধ্যাদেশ বা আচরণ বিধির লঙ্ঘনের জন্য কমিশনকে প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচন স্থগিত করার ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।	**ওয়ার্কাস পার্টি ও বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল** এ ধারা বাতিলের প্রস্তাব করেছে। **জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল** এ ধারাটি পুনঃবিবেচনার প্রস্তাব করে। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ** এ বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করে নি।	'সুজনে'র পক্ষ থেকে নির্বাচনী আইনের গুরুতর লঙ্ঘনজনিত কারণে প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা স্থগিত/বাতিল ইত্যাদির জন্য সিনিয়র জেলা জজ বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ছয়টি বিভাগে ছয়টি 'ইলেকশনস মিসকণ্ডাক্টস এবং ডিসকোয়ালিফিকেশন' কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল করা যাবে। কমিশন ৭২ ঘন্টার মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং কমিশনের রায়ই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। একইসাথে নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নির্বাচনী নিয়ম-কানুন ভঙ্গ বা লঙ্ঘন বা কোন ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক শাস্তির বিধান রাখা প্রয়োজন।
নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা	নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতা রোধে নির্বাচন কমিশনের কোন সুপারিশ নেই।	রাজনৈতিক দলসমূহ এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব করে নি।	২০০১ সালের নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ বিরোধী দলের কর্মীদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার পুনারাবৃত্তি যেন না ঘটে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া জরুরী বলে 'সুজন' মনে করে। তাই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থী বা তার সমর্থকগণ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনরূপ আনন্দ মিছিল, আতশবাজী ফোটানো, রং ছিটানো, মিষ্টি বিতরণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। এ সকল কার্যক্রমকে নির্বাচন পরবর্তী অনিয়ম হিসেবে গণ্য করা হবে।

গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং রাজনীতিকে দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়নের কবল থেকে মুক্ত করে সুস্থ ধারা আনয়নের লক্ষ্যে বাম রাজনৈতিক দলগুলো এবং 'সুজন' বহুদিন থেকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য প্রদানের দাবি করে আসছে। এ ব্যাপারে একটি জনমতও সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তাবিত '*গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০৮*' আইনে পরিনত করার মাধ্যমে তা বাস্তবে রূপ লাভ করবে। তবে আমরা মনে করি যে, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস, নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সাথে সাথে প্রার্থীদের থেকে তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত খসড়ায় পরিবর্তন আনা আবশ্যক। একইসাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংগৃহীত তথ্যের যথাযথ নিরীক্ষার ভিত্তিতে মিথ্যা তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্য গোপনকারীর বিরূদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধানের যথাযথ প্রয়োগও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রাজনৈতিক দলের স্ব উদ্যোগে নিজেদের সংস্কার এবং কালো টাকা, পেশীশক্তির মালিক তথা দুর্বৃত্তদের মনোনয়ন প্রদান থেকে বিরত না থাকলে কোন পরিবর্তনই অর্জিত হবে না।